FEB. 17 2002

আ খ্ তা র - উ ল্ - আ ল ম

বিষয়টা স্পর্শকাতর : তবু এ নিয়ে কিছু লেখা দরকার

বিষয়টা নাজুক– বড়ই স্পর্শকাতর। তবু কেন যেন মনে হচ্ছে এ নিয়ে কিছু লেখা দরকার। বিষয়টা আর কিছু নয় প্রতিবেশী ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে সম্প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে কি এক তুলকালাম কাণ্ডই না ঘটে গেল! বামপন্থী জোট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী কি এক বেফাঁস কথা বলে ফেলেছিলেন– টিভিতে দেখলাম বিশাল সমাবেশ। অনলবর্ষী বক্তৃতা। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, শুনেছি কবি মানুষ। তবুও রাজ্যের রাজনীতি সামাল দিচ্ছেন ভালভাবেই। জ্যোতি বসুর পর বাম জোটকে ধরে রাখা, পুনরায় পশ্চিমবঙ্গের মসনদে সমাসীন করা চাট্টিখানি কথা ছিল না মোটেই। কিন্তু বুদ্ধদেব বাবু তা পেরেছেন। শুধু পেরেছেন নয়, রাজ্যের শাসন ব্যবস্থাও চালিয়ে যাচ্ছেন সমর্থ হাতে। এর মধ্যে ধাক্কা এলো পার্লামেন্ট ভবনে। সন্ত্রাসীরা হামলা চালালো। জনকয়েক পুলিশ মারা গেলেন। গোটা ভারত উত্তাল। টুইন টাওয়ারের পরে সন্ত্রাসীদের এটাই ছিল আরেকটি প্রকাশ্য হামলা। কেউ বলছেন, সাজানো নাটক, কেউ বলছেন সন্ত্রাসীদের টার্গেট ছিল আরও বড়।

কিন্তু ছোট হোক বা বড় হোক, সব দোষ নন্দ ঘোষের মতো করে নিয়ে পড়ল মুসলমানদের ঘাড়ে। মাইকেল মধুসূদন সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক সমালোচক একবার বলেছিলেন, যতই খ্রিস্টান হোন আর বিদেশিনী বিয়ে করুন, তার কোট পাতলুনের নিচে পৈতাটা ছিল ঠিকই– দৃশ্যমান কি অদৃশ্যমান সেটা বড় কথা নয়। বুদ্ধদেব বাবুর বক্তব্যের প্রতিবাদ খোদ পশ্চিমবঙ্গে বহু বুদ্ধিজীবীই করেছেন। বুদ্ধদেব বাবু নিজেও স্বীকার করেছেন যে, মুখ ফসকে বেফাঁস কথা বেরিয়ে গেছে। শোনা যায়, বর্ষীয়ান নেতা জ্যোতি বসুই নাকি বুদ্ধদেব বাবুকে মুসলিম সমাজের কাছে ক্ষমা চাইতে বলেছিলেন। বুদ্ধদেব বাবু নেতার আদেশ শুধু পালনই করেননি– মুসলিম সমাজের গণ্যমান্য নেতৃস্থানীয় এমনকি ধর্মীয় নেতাদের নিয়েও বসেছিলেন। খোলামেলা মতামত প্রকাশের ব্যাপারে এই মাত্র সেদিন কলকাতার দূরদর্শন টিভিতে বহুক্ষণ ধরে এক আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। অংশগ্রহণকারী মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা শুনতে শুনতে মনে হয়েছিল, ওইসব বক্তব্য কতটা পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলিম সমাজের মতামতের প্রতিনিধিত্ব করে, কিংবা আদৌ করে কিনা? আর বুদ্ধদেব বাবুর প্রথম যে বক্তব্য, তাও কতটা পশ্চিমবঙ্গীয় সংখ্যাগরিষ্ঠজনের মতামতের প্রতিফলন ছিল?

আমরা কলকাতার পত্র-পত্রিকা খুব কম পাই। যে আনন্দবাজার মাঝে মধ্যে পাওয়া যায়, তার নীতি ও আদর্শ কারও অজানা নয়। অবশ্য কলকাতার অনেক বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিক-কলামিস্ট ঢাকার পত্র-পত্রিকায় মাঝে মধ্যে লিখে থাকেন। সেসব লেখায় রাজনীতিই বেশি থাকে বটে; কিন্তু ইন বিটুইন লাইন্স বেরিয়ে আসে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক চালচিত্র। কারও কারও রচনায় বা রিপোর্টে পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলিম সমাজের কিছু কিছু চিত্র। সে চিত্র যতটা না উৎসাহ উদ্দীপক তার চেয়ে বেশি বেদনাদায়ক। কোন কোন তুখোড় সাংবাদিক আমাদের মতো সেলফ সেন্সরড না হয়ে, একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি ছুড়ে ফেলে দিয়েই চাঁছাছোলা বক্তব্যও দিতে দ্বিধা কিংবা কুণ্ঠাবোধ করেন না। তেমনি একটা লেখা প্রকাশিত হয়েছে এই সেদিন ঢাকারই একটি জাতীয় পত্রিকায়। লেখাটার হেডিং ছিল– 'কলকাতার আমেরিকান সেন্টারে হামলা ও বুদ্ধদেবের মৌলবাদ সন্ধান।' লেখক কোন রকম রাখ-ঢাক না করেই স্পষ্ট ভাষায় যা উচ্চারণ করেছেন, তা এই 'এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, দাড়ি-টুপি-পাঞ্জাবি বেশধারী মুসলমানদের ইচ্ছামত মৌলবাদী বলে দেয়া হচ্ছে।' আর যত্রতত্র আইএসআই'র চর হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে গ্রেফতারও করা হচ্ছে। মৌলবাদ শুধু ধর্মীয় গহ্বর থেকেই জন্মায় না। রাজনৈতিক গহ্বর থেকেও মৌলবাদের উৎপত্তি হয়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা বা রাজনৈতিক মৌলবাদ কিন্তু কম ভয়ঙ্কর নয়। এ দেশে অধিকাংশ ধর্মীয় দাঙ্গা যে রাজনীতিকদের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত তা আমরা সবাই জানি।' বিশ্লেষণধর্মী এই নিবন্ধটি দিল্লি থেকে পাঠিয়েছেন সুমন ভট্টাচার্য– পেশা সাংবাদিকতা। অন্যরা (এমনকি আমরা এই বাংলাদেশের সাংবাদিকরাও) যে কথা বলতে কোন দিন সাহস পাই না সেই কথা সুমন ভট্টাচার্য অবলীলায় বলে দিয়েছেন। স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'মাদ্রাসার ছাত্ররা উন্মত্ত করসেবকদের মতো কোন ঐতিহাসিক মন্দির ধূলিসাৎ করেছে কি? স্বাধীন ভারতবর্ষে ইসলামে তো স্পষ্ট বলা হচ্ছে দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ এবং তোমার ধর্ম তোমার কাছে, আমার ধর্ম আমার কাছে। এই ধারণাটাও যথেষ্ট ভ্রান্ত যে, মাদ্রাসাগুলোতে গরীবঘরের ছেলেরাই পড়তে আসে। বহু অবস্থাপন্ন অভিজাত ঘরের ছেলেরা এখানে আসে ইসলাম ধর্মকে জানতে। আর মাদ্রাসা মকতবের শিক্ষা তো মুসলমানরা ঐতিহ্য সূত্রেই পেয়েছেন, আকাশ থেকে তো আচমকা পড়েনি। তবে এটা ঠিক যে রাজ্য সরকারের অনুমোদন পাওয়া মাদ্রাসার সংখ্যা যথেষ্ট কম। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গে অননুমোদিত মাদ্রাসা গজিয়ে উঠছে রোজ। ... কোন সন্ত্রাসবাদী যদি নামধারী মুসলমান হন, তার জন্য তো গোটা মুসলিম সমাজ বা ইসলামী শিক্ষার বিদ্যালয় মাদ্রাসাগুলো দায়ী হতে পারে না।' নিবন্ধের উপসংহারে সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য জোর দিয়ে বলেছেন, 'ইসলামে কোথায় লেখা আছে সন্ত্রাসবাদকে মদদ দেয়ার কথা? আমাদের প্রগতিশীল সরকারেরও এটা মনে রাখার সময় এসেছে ধর্মীয় গোঁড়ামি নিয়ে এতো কথা বলার আগে নিজেদের মনের জানালাটা একটু খুলে দেয়া উচিত। তাদের ব্যবস্থা নেয়ার ঠেলায় ইসলাম আর সন্ত্রাসবাদকে যেন কেউ এক না ভাবেন। বেআইনি মাদ্রাসার পাশাপাশি ব্যবস্থা নেয়া হোক বেআইনি মন্দির এবং বেআইনি গির্জাগুলোর বিরুদ্ধেও। তবেই মুখে আনা যাবে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি।' (দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৩/২/০২)।

আমার বিশ্বাস, সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য তার এই নিবন্ধটি নিশ্চয়ই পশ্চিম বাংলার কোন না কোন পত্রিকায় ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছেন। যদি না করে থাকেন, তাহলে পশ্চিম বাংলার কোন সাহসী পত্রিকার প্রতি অনুরোধ রইল, তারা যেন দিল্লি থেকে প্রেরিত এবং বাংলাদেশের পত্রিকায় প্রকাশিত সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্যের এই রচনাটি নিজেদের পত্রিকায় পুনঃপ্রকাশ করেন। আগেই বলেছি, কলকাতার কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট নিবন্ধ আমাদেরও কোন কোন পত্রিকায় পুনঃপ্রকাশিত হয়ে থাকে। তেমনি একটি রিপোর্টের হেডিং : 'পশ্চিমবঙ্গ : নির্জন দ্বীপের মাদ্রাসাগুলো চলে সৌদি সহায়তায়।' ঢাকার জাতীয় দৈনিক সংবাদ'র ৬-২-০২ তারিখে প্রকাশিত আনন্দবাজার পত্রিকায় পুনঃমুদ্রিত এই রিপোর্টটির উল্লেখ প্রয়োজন এ কারণে যে, এই রিপোর্টের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলমানদের এমন এক চালচিত্র যা অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকা মাত্রেরই জানা দরকার। যেমন মূল ভূখণ্ড থেকে শত কিলোমিটার দূরে পদ্মার বুকে ছোট, নির্জন দ্বীপের একটি মাদ্রাসার কথা বলতে গিয়ে ওই দ্বীপবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'দ্বীপে সাকুল্যে দুটি গ্রাম পিরোজপুর ও বাজিতপুর। হাজার ছয়েক জনবসতির গ্রাম দুটিতে মাত্র ১০ জন ২০ বিঘা জমির মালিক। বাকিরা প্রান্তিক চাষী, ক্ষেতমজুর। ... গ্রাম দুটিতে কারও পাকা বাড়ি নেই, বিদ্যুৎ নেই, ডাকঘর নেই, রেশন দোকান নেই, স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র (ওই কেন্দ্রটি যে আসলে কি তা আমি নিজেও বুঝতে পারিনি) থেকেও নেই। ... হাজার খানেক পরিবারের অর্ধেকই তো দু'বেলা পেট পুরে খেতে পায় না। ... বেলডাঙ্গা এলাকায় সরকারি হিসাবেই দারিদ্র্যসীমার নিচের ভূমিহীন মজুরের সংখ্যা ৪০ শতাংশ।'

মূল রিপোর্টের বক্তব্য হল, এইসব গরিব লোক কিভাবে বড় বড় মাদ্রাসা চালায়? সুতরাং এর টাকা আসে সৌদি থেকে। আর তাই ... রিপোর্টটি হয়েছে আনন্দবাজারের নীতি ও আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ! কিন্তু সবচেয়ে অবাক ব্যাপার, এই আনন্দবাজারই এই মাত্র সেদিন (৬ই ফেব্রুয়ারি/০২) একটা নিবন্ধ প্রকাশ করেছে। নিবন্ধটির লেখক শুভেন্দু দাশগুপ্ত– কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিভাগের অর্থনীতির শিক্ষক। নিবন্ধের একটা স্থানে বোল্ড টাইপে লেখকের যে বক্তব্য আনন্দবাজার পত্রিকা তুলে ধরেছে তা এরকম : 'এই পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টেরই রাজত্বে বুঝতে পারছি সাম্প্রদায়িকতা কাকে বলে। প্রশাসনে সাম্প্রদায়িকতা, দলের সাম্প্রদায়িকতা, ভাবনার সাম্প্রদায়িকতা। আমরা এখন খোঁজখবর নিচ্ছি মাদ্রাসায়, মসজিদে, পাড়ায় পাড়ায়, চায়ের দোকানে, সীমান্তের ধারে, পশ্চিমবঙ্গে।' পুরা লেখাটা যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে ঠেস দিয়ে লেখা খুব সম্ভব সে কারণেই কলকাতা ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির অধ্যাপক শুভেন্দু বাবুর এই লেখাটা আনন্দবাজার পত্রিকা এতটা যত্ন করে ছেপেছে।

কিন্তু শুভেন্দু বাবু পণ্ডিত মানুষ। তার রচনার ফাঁকে ফাঁকে শুধু নয়, গোটা রচনার প্রতিটি ছত্রেই ফুটে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ তথা গোটা ভারতের মুসলমানেরা কেন এতটা ক্ষুব্ধ। কলকাতার আমেরিকান সেন্টারে হামলা তো একটা উপলক্ষ মাত্র। এ ধরনের ক্ষোভ আর ক্ষুব্ধতা দিনে দিনে পুঞ্জিভূত হতে হতে যে কোন উপলক্ষেই ফেটে পড়তে পারে। ফেটে পড়ে। আর তাই নিয়ে শুরু হয় তুলকালাম কাণ্ড। যেমন এবার হয়েছে কলকাতা-পশ্চিমবঙ্গে। তারপর থেকেই সেই যে মুসলমানদের ব্যাপারে 'খোঁজখবর নেয়া'র যে হিড়িক পড়ে গেল, অধ্যাপক শুভেন্দু দাশগুপ্ত নিজেও মনের খেয়ালে সেই 'খোঁজখবর' নিতে লেগে পড়লেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় শুভেন্দু বাবুর রচনার শিরোনামটাও তাই 'চারিদিকে সাজ সাজ রব, খোঁজ নাও খোঁজ নাও!' শুভেন্দু বাবু লিখেছেন : 'তো আমিও মুসলমানদের নিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছিলাম। আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করছি ১৬ বছর। আমাদের বিভাগে আমার এতদিনের পড়ুয়াদের মধ্যে ১ জন মুসলমান। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস ম্যানেজমেন্ট বিভাগেও পড়াই। ১৬ বছরের শিক্ষকতায় ১ জন মুসলমান ছাত্র। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে একটা স্পেশাল পেপার পড়িয়েছি চার বছর। একজন মুসলমান ছাত্র। এর আগে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট ক্যালকাটায় গবেষকের চাকরি করেছি সাড়ে ৪ বছর। পড়াতে হতো। মুসলমান ছাত্র ২ জন। নিজে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র। আমার সতীর্থ দুজন মুসলমান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্ভবত ৭০০-র কাছাকাছি শিক্ষক-শিক্ষিকা। আরবি আর ফারসি বিভাগ বাদ দিলে আমার জানা ১ জন মুসলমান শিক্ষক। আমার ছেলে ভারতের অন্যতম নামি আইনের বিদ্যালয়ে পড়তে গেছে। ওদের ক্লাসে একজন মুসলমান ছাত্রী।'...

প্রফেসর শুভেন্দু দাশগুপ্ত তার নিবন্ধে ভারত সরকারের একটা সার্ভে রিপোর্টের বরাত দিয়েছেন। রিপোর্টটা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, এই রিপোর্টে (সময়কাল জুলাই ১৯৯৯ থেকে জুন ২০০০) ধর্মীয় ভিত্তিতে বেকারত্ব, চাকরিসহ বিভিন্ন বিষয়ে জরিপকৃত তথ্য ও পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। যেমন, 'প্রতি ১০০০ জন গ্রামীণ মুসলমান পুরুষের মধ্যে অশিক্ষিত ও প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষিতের সংখ্যা ৭১২ জন। একই মাপে গ্রামীণ মুসলমান মহিলার সংখ্যা ৮৬৩ জন, শহুরে পুরুষের সংখ্যা ৫৩৩ জন, শহুরে মহিলা ৬৯০ জন। ... ২৪ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি ১০০০ জন গ্রামীণ মুসলমান পুরুষের মধ্যে বিদ্যালয়ে গেছেন ৩৮৮ জন, ওই বয়েসী ১০০০ জন মহিলার মধ্যে বিদ্যালয়ে গিয়েছেন ৩০৩ জন। একই মাপে শহুরে পুরুষদের মধ্যে ৪৪৭, শহুরে মহিলা ৪০৬ জন। প্রতি ১০০০ গ্রামীণ মুসলমান পরিবারের মধ্যে ৯০০ পরিবারের (চাষ করা) জমির পরিমাণ ১ হেক্টর (আড়াই একর) অথবা তার কম। এর মধ্যে ৫১২টি পরিবারের জমির পরিমাণ শূন্য হেক্টর– (নেই অথবা সামান্য) প্রতি ১০০০ মুসলমান পরিবারের মধ্যে ২৯৬টি পরিবারের আয় নিয়মিত মজুরি বা বেতন পাওয়া কাজ থেকে। ... প্রতি ১০০০ জন মুসলমান মানুষের মধ্যে নিয়মিত মজুরি বা বেতন পাওয়ার কাজ করেন ২৭৩ জন। ... প্রতি ১০০০ মুসলমান গ্রামীণ পুরুষ শ্রমদলের মধ্যে কাজ পেয়েছেন ২২ জন। প্রতি ১০০০ মুসলমান গ্রামীণ মহিলা শ্রমদলের মধ্যে কাজ পেয়েছেন ১৮ জন। একই মাপে ৪৬ জন শহুরে পুরুষ আর ৬৭ জন শহুরে মহিলা। গ্রামের মুসলমান মানুষজনের মধ্যে ২৯ শতাংশ ৩০০ টাকার কম মাসিক খরচ করেন, অন্যদিকে ১২ শতাংশ ৬১৫ বা তার বেশি টাকা খরচ করেন। শহরের ৪০ শতাংশ মাসে ৪২৫ টাকার কম খরচ করেন। উল্টোদিকে ৬ শতাংশ ১১২০ ও তার বেশি টাকা খরচ করেন।'

এত কিছু তথ্য পরিসংখ্যান তুলে ধরে শুভেন্দু বাবু লিখছেন : 'এ তো হল সারা ভারত জুড়ে মুসলমান জনগোষ্ঠী কেমন আছেন তার খোঁজখবরের কয়েকটি নমুনা। ... সারা ভারতের যে হিসাব তার সঙ্গে মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি হিসাব (নিম্নরূপ) : 'পশ্চিমবঙ্গে প্রতি ১০০০ মুসলমান পরিবার পিছু ৯৪৮ জনের জমির পরিমাণ ১ হেক্টর অথবা তার কম। প্রতি ১০০০ জন মুসলমান ব্যক্তি পিছু ৬১৬ জনের জমির পরিমাণ ১ হেক্টর অথবা তার কম। এই রাজ্যে মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতি ১০০০ জন কাজের মানুষ হিসাবে গ্রামীণ পুরুষ কাজ পেয়েছেন ১৮ জন, গ্রামীণ মহিলা ৭ জন, শহুরে পুরুষ ৫৭, আর শহুরে মহিলা ৬৮। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে প্রতি ১০০০ মুসলমানের মধ্যে ৩০০ টাকার কম ব্যয় করেন ৩০০ জন। আর ৬১৫ টাকা বা তার বেশি খরচ করেন ৫০ জন, শহুরে ৪২৫ টাকার নিচের ব্যয়ের তালিকায় ৪০১ জন, ১১২০ টাকা ও তার বেশি ব্যয়ের তালিকায় ৬৭ জন।' পরিশেষে শুভেন্দু বাবু লিখেছেন, 'এই হল পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের খোঁজখবর। এইসব খোঁজপাতি পাওয়ার পর অবশ্যই প্রশাসনকে, পুলিশকে, দলের ক্যাডারদের আদেশ-নির্দেশ দেয়া একান্ত জরুরি– কেন মুসলমানরা শিক্ষিত হতে চাইছে না, বেশি জমি পেতে তাদের ইচ্ছে করছে না। কাজ করার মন নেই, খরচ বাড়াবার আগ্রহ নেই।'

শুভেন্দু বাবুর লেখাটা বেরিয়েছে গত ৬ ফেব্রুয়ারি, আনন্দবাজার পত্রিকায়। এই লেখা প্রকাশের পর বাম সরকারের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলমানদের 'এই অশিক্ষিত হয়ে থাকার, বেকার হয়ে থাকার, দরিদ্র হয়ে থাকার' পেছনে সত্যি কোন ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে কিনা, তা জানতে বড্ড ইচ্ছা করে। আজ এ পর্যন্তই।

আখতার-উল-আলম : *উপদেষ্টা সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাক*